প্রতিরোধের উপস্থাপনঃ প্রসঙ্গ মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্প

দেবাশীষ রক্ষিত,গবেষক,সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

মেইল আইডিঃ debasisrakshit350@gmail.com

সারাংশঃ

বিশ শতকের ষাটের দশকের লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী মাটি আর মানুষ নিয়েই গড়ে তুলেছেন তাঁর গল্পের জগৎ। তাঁর লেখায় বার বার ফিরে এসেছে 'The voiceless section of Indian society'। লেখিকার কথায় 'সমাজের এই অংশকে না জানলে ভারতবর্ষকে জানা যায় না'। মূলস্রোত থেকে বিছিন্ন যে অন্ত্যজ সমাজ ও মানুষ শোষন-নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হয় 'তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র, ও সূর্যসমান ক্রোধই' লেখিকার সকল লেখার প্রেরণা। আসলে তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজ পরিবর্তিত হয়, সময়ের সাথে শোষণ প্রক্রিয়াও পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সংগ্রাম অক্ষুন্ন থাকে। তাঁর গল্পগুলির দিকে নজর দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। 'বিছন' গল্পে দেখি দুলনের মতো ব্রাত্য মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একমুঠো বিছনের জন্য লড়াই। 'বাঁয়েন' গল্পে চন্ডীর স্বামী-সংসার সবকিছুই ছিল, কিন্তু সমাজ তাকে করেছে পরবাসী। পরির্বতে সমাজ উপহার দিয়েছে তিন অক্ষরের নাম বাঁয়েন। নিজের মৃত্যুর বিনিময়ে প্রমাণ করতে হয় সে বাঁয়েন নয় স্নেহময়ী জননী। 'দ্রোপদী' গল্পে দ্রোপদীর নগ্নতা তার শক্তির আধার হয়ে উঠেছে সেনানায়ক সেখানে পরাজিত। আবার 'ভাত', 'নুন', 'ঘর', 'মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাদ' এই গল্পগুলিতে লক্ষ করি মানুষের নূন্যতম মৌলিক অধিকারের জন্য সংঘর্ষকে। সমাজের মূলস্রোত যাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সেই বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে উঠে এসেছে- এই দিকটিকেই আমার আলোচনার বিষয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

সূচক শব্দঃ শোষণ, সংঘর্ষ, স্বাধিকার, প্রতিবাদ, স্বয়ংসম্পূর্ণা

মূল প্রবন্ধঃ

বিশ শতকের ষাটের দশকের লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর গল্পকে মাটির সঙ্গে যোগই স্বাতন্ত্র দিয়েছে। তিনি সামগ্রিক হতাশার অবস্থার মধ্যেও তৃষ্ণা মেটাবার জন্য পরিষ্কার জল খোঁজেন, যে জল আছে মাটিতে। মাটি আর মানুষ নিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর গল্পের জগৎ। ইতিহাস ও সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা তাঁর শিল্পীসত্তার উৎস। তিনি আজীবন শোষিত-বঞ্চিত-অত্যাচারিত মানুষদের পাশে থেকেছেন, নিম্নবর্গীয়-অন্ত্যজদের যাপনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখে তাদের কথা দেশবাসীকে জানাতে চেয়েছেন। নিজের লেখা সম্পর্কে তিনি একটি মন্তব্য করেন "...সাহিত্যের দাবি জীবনের দাবির সঙ্গে যেন এক হয়ে গেল, এক হয়েই আছে আজও। মানুষ হিসেবে যদি আমি সততা, প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, প্রতিবাদে বিশ্বাসী হই, সাহিত্যে কী করে আমি অন্য কথা বলি, মুখ ফিরিয়ে থাকি-।"[১]

মহাশ্বেতা দেবীর সৃষ্টিশীল সত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটে যদিও চল্লিশের দশকে 'রংমশাল' পত্রিকায়। কিন্তু তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নটী' মুদ্রিত হয় ১৯৫৭ তে। গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ষাটের দশক থেকে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হলো- 'সোনা নয় রূপো নয়'(১৯৬০), সপ্তপর্ণী(১৯৬১), স্তনদায়িনী ও অন্যান্য(১৯৭৯), দৌলতি(১৯৮৪) –ইত্যাদি।

তাঁর লেখায় বার বার ফিরে এসেছে 'The voiceless section of indian society'[২] লেখিকার কথায় 'সমাজের এই অংশকে না জানলে ভারতবর্ষকে জানা যায় না'[৩]। এই অংশ এখনও নিরক্ষর, স্বল্পাক্ষর ও অনুন্নতই শুধু নয়, মূল স্রোত থেকে এরা বড়োই বিচ্ছিন্ন। এই অন্ত্যজ সমাজ ও মানুষ-নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হয়, এর বিরুদ্ধে 'নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যসমান ক্রোধই' লেখিকার সকল লেখার প্রেরণা। সমাজ পরিবর্তিত হয়, সময়ের সাথে সাথে শোষণ প্রক্রিয়াও পরিবর্তিত হতে থাকে, কিন্তু সংগ্রাম থাকে অক্ষুন্ন। সভ্যতার নামে যতদিন উৎপীড়ন থাকবে, ততদিন অক্ষুন্ন থাকবে এই সংগ্রাম। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ছোটগল্পে এই শোষণ আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চিত্র ফুটে ওঠে। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের এই দিকটিই আমার আলোচনার বিষয়ের ক্ষেত্র।

ডোম নামক অন্ত্যজ শ্রেণীকে নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর 'বাঁয়েন' গল্পটিতে দেখা যায় কীভাবে সামাজিক কুসংস্কারের বলি হয় চন্ডী। সামাজিক অবস্থানগত দিক থেকে এরা নিম্নগোত্রীয়। তাদের মধ্যে একটি প্রচলিত সংস্কার আছে কাউকে বাঁয়েনে ধরলে মারতে নেই। বাঁয়েন মারলে সমাজের পক্ষে তা অমঙ্গলজনক, এমনকি বাঁয়েনের ছায়াও মাড়াতে নেই। চন্ডীর স্বামী-সংসার সবকিছুই ছিল, কিন্তু

সমাজ তাকে বানিয়েছে বাঁয়েন। সমাজের অসাধ্য কিছুই নেই, সমাজ কিনা পারে তা লেখিকা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন। বাঁয়েন পূর্ববর্তী জীবনে চন্ডী তার পৈতৃক পেশা ভাগাড়ের কাজ না করার জন্য অগ্রাহ্য করলেও, সমাজ তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে। পরিবর্তে উপহার দিয়েছে তিন অক্ষরের নাম 'বাঁয়েন'। সব থাকা সত্ত্বেও করেছে তাকে পরবাসী। তাই নিজের জীবন দিয়ে তাকে প্রমাণ করতে হয় "আমি বাঁয়েন লই গো, মোর বুকে কচি ছেলা, মোর বুক দুধে ফেটে যায়।"[৪] আসলে সে-ও রক্ত মাংসের মানবিক গুনসম্পন্ন স্নেহময়ী জননী এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিল। সামাজিক কুসংস্কারকে সামনে রেখে অন্যায় আর নিপীড়নের পটভূমি নির্মাণ করেছেন এই গল্পে। এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কঠোর লড়াই করে বাঁচতে হবে। নিপীড়িত জনের দৃষ্টিকোন থেকে তাদের দেখার চেষ্টা করেছেন লেখিকা। তাদের সমস্যা অনুভবগম্য করে, তাদের মধ্যে স্বাধিকার বোধের সঞ্চার করতে চেয়েছেন।

'বিছন' গল্পের মূল অবলম্বন যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, সে দুলন গঞ্জু। বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে রাজপুত লছমন সিং। দুলন গঞ্জুর মতো ব্যক্তি, যারা সমাজে ব্রাত্য বলে পরিচিত, তাদের লড়াইয়ের চিত্র গল্পের প্রতিটি ছত্রে ফুটে ওঠে। গল্পে সর্বোদয়ের নেতা-কর্মীদের চাপে লছমন সিং জমি দান করে, কিন্তু সে জমি অনাবাদী। এতে তার কোনো ক্ষতি নেই, বরং "জমি দেবার ব্যাপারটি সর্বার্থসাধক। বাঁজা জমি বেরিয়া গেল। গ্রহীতাদের কিনে রাখা গেল। সরকারের কাছে খুঁটি আরও শক্ত হল।"[৫] সেইসময় এরকমই একটি জমির মালিক হয় দুলন। ফসলি জমি না হওয়া সত্ত্বেও সরকারের কাছ থেকে আদায় করে বীজ আর সার। যা বিক্রি করে সে আনে 'বিছন'। লছমন সিংয়ের চোখ রাঙানিতে সে বাধ্য হয় সাধারণ জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে। গল্পটির মধ্যে বার বার প্রতাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা উঠে আসে। যে লড়াইয়ে হারিয়ে যায়, দুলন গঞ্জুর আশেপাশের অনেক ব্যক্তি আর তাদের মৃত্যুর স্বাক্ষী হয়ে বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় দুলনকে। ধীরে ধীরে মানুষের মনে জাগ্রত হয় স্বাধিকার লড়াইয়ের চেষ্টা। শ্রমের পাওনার দাবি জানায় আসরফিরা। দুলনের ছেলে ধাতুয়াও এই দলে নাম লেখায়, প্রতিবাদ করতে গিয়ে তারা মাটিতে পড়ে যায় চাপা। জীবনে সত্যের সাথে লড়াইয়ে চিরকাল হারিয়ে যায় তারা।

শোকে উন্মাদ দুলনের পরিশ্রমে কাকুরে জমিতেও বিছন ধানের ফলন হয়, কিন্তু এই ধান সে কাটতে দেয় না। কারণ "করণ, আসরফি, মোহর, মহুবন, পারশ ও ধাতুয়ার মাংসমজ্জার সারে পুষ্ট"[৬]এই ধান তা কেউ জানে না। তাই চিরদিন যে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি, সেও

প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। লছমন সিংকে পাথর দিয়ে মেরে তাকে পাথর চাপা দিয়ে দেয়- একথাও কেউ জানে না। আসলে অন্ত্যজ মানুষ যেমন করে হারিয়ে যায়, লছমন সিংও তেমনি হারিয়ে যায়। এভাবে যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার প্রাণের বিনিময়ে টিকে আছে নিম্নবর্গীয় সমাজ। এপ্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্পের 'ভূমিকার পরিবর্তে' অংশে অজয় গুপ্ত বলেন "মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাসের কথা বলেন, ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যেই সভ্যতা এগিয়ে চলবে। আর, ধ্বংসের বীজ সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই সভ্যতার ভবিতব্য। voiceless section-কে পথিপার্শ্বে ফেলে রেখে দুর্বার গতিতে সে ছুটে যায়...।"[৭] উচ্চবর্গীয় মানুষ তাদের অবিশ্রান্ত শোষণ করে চলেছে। আর এই শোষিত মানুষেরা করে চলেছে টিকে থাকার লড়াই। কারণ তাদের কাছে 'বিছন মানে বেঁচে থাকার লড়াই।'[৮] দুলনের কাছে তাই তাঁর ছেলে বিছন হয়ে যায়। যে ছেলে বেঁচে থাকতে পিতার মুখে অন্ন তুলে দিতে পারেনি, মরে গিয়ে সে ধান হয়ে জন্মায়। দুলনের মধ্যে তাই আশ্চর্য প্রসন্নতা "দুলন আস্তে আস্তে মাচানে ওঠে। মনের মধ্যে একটা সুর। অবাধ্য। ফিরে ফিরে আসছে। ধাতুয়া গানটা বেধেছিল। 'ধাতুয়া'- বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল। ধাতুয়া তোদের হম্ বিছন বনা দিয়া।"[৯]

নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রোপদী' গল্পটি। এই গল্পে আদিবাসীদের জীবনের নানা বঞ্চনা, সংস্কার ও গৌরবের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নারীর চিরন্তন দুর্বলতা, নগ্নতাকে শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এই গল্পে। এখানে দ্রোপদী স্বয়ংসম্পূর্ণা, মহাভারতের মতো কৃষ্ণের প্রয়োজন হয়নি। সমস্ত জিনিসটাই একটি প্রতিবাদ মূলক পটভূমি তৈরি করছিল। গল্পের শেষের দিকে সেনানায়কের প্রতি দ্রোপদীর উক্তি "কাপড় কী হবে, কাপড় ? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে ? মরদ তু ?"[১০]। এরপরই দেখা যায় "দ্রোপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে ভয় পান ভীষন ভয়।"[১১] আসলে এই সেনানায়কেরা পারে মেয়েদের উলঙ্গ করতে, তাদের লালসা চরিতার্থ করতে কিন্তু সম্মান দিতে পারে না। সেই সম্মান দ্রোপদী নিজেই আদায় করে নিতে চেয়েছে – সেনানায়ক সেখানে পরাজিত।

ভাত, নুন, জল, ঘর- এগুলি মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা। কিন্তু এই ন্যূনতম চাহিদাও পূর্ণ হয়নি। 'নুন' গল্পে লেখিকা দেখিয়েছেন সামান্য নুনের জন্য মানুষকে লড়াই করতে হয়, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই নুন সংগ্রহ করতে হয়। মহাজন উত্তমচাঁদ কয়েকপুরুষ ধরে কোয়েল নদীর গা ঘেঁষে থাকা আদিবাসীদের বেঠবেগারিতে বেঁধে রেখেছিল। কেননা বেঠবেগারি যে বে-আইনি তা জানত না

তারা। চতুর্থ নির্বাচনের পর যখন চাপে পড়ে উত্তমচাঁদ বেঠবেগারিতে আর পূর্তি মুন্ডাদের খাটাতে পারেনি, তখন "হাতে নয়, রুটিতে নয়, নিমক সে মারেগা বলেছিল উত্তমচাঁদ।"[১২] এরপরই হাটে নুন বিক্রি করা বন্ধ করে দেয় সে। তাই "ঝুঝার গ্রামবাসীদের কাছে এখন বেঠবেগারি দেবার, ফসল না-পাবার দিনগুলিকে অনেক সুখের মনে হয়।"[১৩] কেননা তখন নুন ছিল, যা- জীবনধারন ও দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য জরুরি কিন্তু ভীষন সস্তা। সেই ন্যূনতম নুন আজ তাদের কাছে মহা মূল্যবান সম্পদ। অসহায় মানুষগুলো জঙ্গল থেকে হাতির সলটলিক থেকে নুন চুরি করার জন্য যেতে বাধ্য হয়। কেননা "নুন ও জল শরীরের ইনঅর্গানিক বা মিনারেলের উপাদান। প্রাণের পক্ষে এরা অপরিহার্য।"[১৪] বাঁচার তাগিদেই পূর্তিরা হাতির নুন মাটি চুরি করতে গিয়ে মারা যায়। অথচ 'নুন কিনতে পারলে তিনটি মানুষ ও একটি হাতি মরত না।'[১৫] কিন্তু এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে- উত্তমচাঁদ ? সমাজ-আইন না নিয়ম ? আসলে পূর্তিদের মৃত্যুর কোনো সহজ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কেননা মহাজনেরা কোনোদিন বুঝবে না আদিবাসীদের জীবন ও লড়াইকে। লেখিকা যেন উত্তমচাঁদের মতো মহাজনের স্বরূপ তুলে ধরে, তাদের শাসন-শোষণের প্রতি কষাঘাত আনার চেষ্টা করেছেন 'ব্যাপারটি তাদের কাছে অবাস্তব থেকে যাবে।'[১৬] নুন যে মানুষের জীবন নড়িয়ে দিতে পারে, তা বুঝবে না তারা কোনোদিন।

শুধু নুন'ই নয় একমুঠো ভাতের জন্যও মানুষ অসহায়। যার পরিচয় রয়েছে 'ভাত' গল্পে। গল্পের অবলম্বন চরিত্র উৎসব যার সামাজিক কোনো মূল্য নেই। উৎসব থেকে সে উচ্ছব নাইয়া হয়ে দাঁড়ায়। গল্পটিতে একদিকে আছে এক সম্পন্ন সংসার আর অন্যদিকে রয়েছে নিরন্ন মানুষের ভাতের জন্য সংগ্রাম। পরিবারের কর্তা মৃত্যু সজ্জায়- তাই চিকিৎসা এবং তান্ত্রিকের হোম দুইই চলছে। বড়ো লোকের বাড়িতে বাদা থেকে চাল আসে, মানুষ যে এত সুস্বাদু খাবার খেতে পারে উচ্ছবের কাছে তা অকল্পনীয় "ঝিঙেশাল চালের ভাত নিরামিষ তরকারির সঙ্গে। রামশাল চালের ভাত মাছের সঙ্গে...বামুন-চাকর-ঝিদের জন্য মোটা সাপটা চাল।"[১৭] উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে যেন প্রচ্ছন্ন একটি ব্যঙ্গাত্মক শ্লেষ। কারণ পরমুহূর্তেই উচ্ছবকে আমরা বলতে দেখেছি "বাদায় এদের চাল হয় । তা দেখি বাসিনী। এক মুষ্টি চাল দে। গালে দে জল খাই...সেই কদ্দিন ঘরে আদা ভাত খাই না। দে বাসিনী, ব্যাগ্যতা করি তোর।"[১৮] এই উৎসবের সবই ছিল। সাজানো সংসার, স্ত্রী-সন্তান সব। কিন্তু বন্যায় স্ত্রী, সন্তান, জমি দরখাস্তের কৌটা সব হারিয়ে যায়। লেখিকা যেন ব্যঞ্জনাময় ধ্বনিতে উচ্ছবের পরিচয় দিয়েছেন- 'উচ্ছব নাইয়া।পিং হরিচরণ নাইয়া।সে কৌটাটা-বা কোথায়।'[১৯] এদিকে তান্ত্রিক বিধান দিয়েছেন যজ্ঞ যত সময় চলবে ততক্ষন বাড়িতে কেউ কিছু খেতে পারবে না। উচ্ছবের ক্ষুধা

কিন্তু উঠতে থাকে। হঠাৎ পূজা শেষ হবার শেষমুহূর্তে কর্তা চোখ বোজেন। ফলত নতুন শাস্ত্র জারি হয়- অশৌচের বাড়ির সব খাবার ফেলে দিতে হবে। কিন্তু উচ্ছবের আত্মা ভাতের গন্ধে আহত ও হিংস্র হয়ে ওঠে। তাই পিতলের বিশাল অন্নপাত্রটি নিয়ে চলে যায় সবার নাগালের বাইরে। যদিও "আসল বাদার খোঁজ করা হয় না আর উচ্ছবের। সে বাদাটা বড়ো বাড়িতে থেকে যায় অচল হয়ে।"[২০] বড়ো বাড়িতে অশৌচের ভাত ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু উচ্ছবের মতো মানুষের কাছে সেটা জঠর জ্বালা নিবারণের মহৌষধি। এই দুটি চিত্র পাশাপাশি রেখে লেখিকা যেন এই সামাজিক বিধানের প্রতি প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্রূপ করেছেন। বোঝাতে চেয়েছেন ক্ষুধার্ত পেট শাস্ত্র মানে না।

'মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাদ' ছোটগল্পে দেখানো হয়েছে মানুষ তার সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, বেঁচে থাকার জন্য ভিখারি বৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া তার কোনো উপায় থাকে না আর। নওয়াগড়ের জমিদার রাজাসাহেবের সিপাহী ও পুলিশে মেলে দুসাদের বকরা-বকরি কেড়ে নিয়ে যায় রাজাসাহেবের অতিথি অভ্যর্থনার জন্য। তখন বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত দুসাদ বুঝতে পারে "ভিখারির মৌল অধিকার যে বারবার ক্ষুন্ন হয় ? রাজাসাহেবের ক্ষতিপূরণ মেলে, ভিখারির মেলে না কেন ?"।[২১] তাহলে মৌল অধিকার শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য । সম্পত্তির অধিকারও তো মৌল অধিকার, তাহলে ভিখারি দুসাদ কেন ক্ষতিপূরণ পায় না ? এই প্রশ্ন দুসাদের মতো প্রতিটি মানুষের- যারা অধিকার থেকে বঞ্চিত, উচ্চবর্গীয়দের শাসন-শোষণে জর্জরিত। দুসাদের ক্ষত-বিক্ষত মুখে চিহ্ন থেকে যায়, মৌল অধিকার রক্ষার প্রথম ও শেষ প্রতিবাদের। লেখিকা তাই গল্পের শেষে ব্যঙ্গের ঢঙে বলেছেন "ভিখারি দুসাদ সাত নম্বর মৌল অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও, তিন নম্বর মৌল অধিকারের প্ররক্ষতা পেয়েছে। স্বাধীনতার অধিকার। ও যাতে জন্ম-জন্মকাল ভিখ মাঙাই থেকে যায়, ভারতের সংবিধান নিশ্চয় তা দেখবে।"[২২] নির্যাতিত দুসাদ সমাজের কাছে, প্রশাসনের কাছে প্রতিকারের পথ না পেয়ে, নিজেই তা খুঁজে নেয় ভিখারি বৃত্তি অবলম্বন করে। উচ্চবিত্ত সমাজ কোনোদিনই নিম্নবর্গীয়দের উঠতে দেবে না, তাদের পথের বাধা হয়েই থাকবে। এই বাধার প্রতিকারের পথ না দেখালেও, লেখিকা সেই শোষণ যন্ত্রের প্রতি বিদ্রূপ করেছেন।

গল্পগুলির এজাতীয় পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায়- অন্ত্যজ সমাজের কণ্ঠস্বর মহাশ্বেতা দেবীর গল্পগুলিতে উঠে এসেছে শোষণের মূর্তিটাকে প্রতিফলিত করার জন্য। অলোক রায় তাঁর 'ছোটগল্পে স্বদেশ স্বজন' গ্রন্থে এপ্রসঙ্গে বলেন "ছোটগল্প হিসেবে অনবদ্য কিন্তু শুধু গল্প শোনানো তাঁর উদ্দেশ্য

নয়। আগুন জ্বালানো, পথ দেখানো, মানে খুঁজে বার করার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উদ্দেশ্য সাধনে এসব গল্প বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় কীর্তি।”[২৩] এই আগুন প্রতিবাদের আগুন, প্রতিরোধের আগুন। স্বাধীনতার পরও যখন দেশের মানুষ তাদের ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, সেখানে সূর্য সমান ক্রোধই বেরিয়ে আসে। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে বঞ্চিত মানুশের জীবনবাস্তবতা পাঠককে যেন এক অজানা মহাদেশে নিয়ে যায়। হতবিহ্বল পাঠক মানস জাগরনের তীব্র বেদনাকে ধারণ করে অনাবিষ্কৃত মানবজীবনের প্রতি সহানুভূতিতে সিক্ত হয়।

তথ্যসূত্র:

১। মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৯

২। ঐ, পৃ-১০

৩। ঐ, পৃ-১০

৪। মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৪২

৫। ঐ, পৃ-১৬১

৬। ঐ, পৃ-১৭৮

৭। ঐ, পৃ-১৩

৮। ঐ, পৃ-১৭৮

৯। ঐ, পৃ-১৭৮

১০। ঐ, পৃ-৭১

১১। ঐ, পৃ-৭১

১২। ঐ, পৃ-১১৩

১৩। ঐ, পৃ-১১৫

১৪। ঐ, পৃ-১১৬

১৫। ঐ, পৃ-১২৩

১৬। ঐ, পৃ-১২৪

১৭। ঐ, পৃ-২১০

১৮। ঐ, পৃ-২১০-১১

১৯। ঐ, পৃ-২১১

২০। ঐ, পৃ-২১৬

২১। ঐ, পৃ-১৪৩

২২। ঐ, পৃ-১৪৫

২৩। আলোক রায়, ছোটগল্পে স্বদেশ স্বজন, প্রথম প্রকাশ ২৫বৈশাখ ১৪১৭, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ-২৪৩

আকর গ্রন্থ:

- মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সহায়ক গ্রন্থ:

- আলোক রায়, ছোটগল্পে স্বদেশ স্বজন, প্রথম প্রকাশ ২৫বৈশাখ ১৪১৭, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা
- শ্রাবণী পাল(সম্পাদিত), বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক, প্রথম প্রকাশ মে ২০০৮ অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা ৬
- শুভেন্দু মণ্ডল, প্রতিরোধের উপস্থাপন মহাশ্বেতা দেবী এবং মামণি রয়ছম গোস্বামী, প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৪২৩, পুস্তক বিপণি, কলকাতা
- রবিন পাল, ছোটগল্পের বিন্দু বিশ্ব, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৩, পুস্তক বিপণি, কলকাতা